জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলিম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলিমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোন আলিমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে অথচ সংশ্লিষ্ট আলিম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ্ একা তথাকথিত আলিম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে ঃ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের ইল্‌ম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআনে পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদের শুনিয়েছে---যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুঁশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামী-দামী উকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলিম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মকর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েয ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কিসসা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট ইবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই ঃ

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○

অর্থাৎ তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজকর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্মকর্ম করে যাচ্ছে।

মোট কথা এই যে, কোরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফিক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ মূর্খ জনগণের

পক্ষে আলিমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন আলিমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস ঃ উপরোক্ত মুনাফিকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ অর্থাৎ এরা বাহ্যত আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশত নিজে আপনার কাছে আসেনি। এরা শুধু তাদের বাসনা অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা-না-মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্য হুঁশিয়ারি রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আদেশ জানা এবং তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলিমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীগণের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতি সাধন ঃ ইহুদীরা আল্লাহ্র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং আল্লাহ্র নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ ঃ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তৎস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যও একটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যত করা যায় এবং কেউ কেউ করেছেও। কিন্তু এর হিফাযতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহ্র বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের সকল দুষ্কর্ম ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ ঃ দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ—অর্থাৎ তারা سحت (সুহ্ত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহতের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেওয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত

না হলে আল্লাহ্ তা'আলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দেবেন। অর্থাৎ তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), ইবরাহীম নখয়ী (র), হাসান বসরী (র), মুজাহিদ (র), কাতাদাহ্ (র) ও যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্‌ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহীতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে সমাজে ঘুষ চালু হয়ে যায়, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জানমাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহ্‌ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও সহীহ্ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেওয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে।—(জাস্‌সাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনত জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণত যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে কাজের জন্য কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী কর্মকর্তা ও করণিকগণ চাকরির অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য; এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত হবে। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তা-ও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ্জ, তিলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি ইবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এর জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফিকাহ্‌বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযের ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষ গ্রহণ করে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ্ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্ মুসলমানদের এ থেকে রক্ষা করুন।

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا

النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ
يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ
وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝ وَقَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ ۫ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ
فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ۙ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَهُدًى
وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
فِيْهِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝
وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا
تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ؕ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ
وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۝
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُوقِنُونَ ۝

(৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলিমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ আল্লাহ্‌র গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর আর আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কর্ণের বিনিময়ে কর্ণ, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমসমূহের বিনিময়ে সমান জখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালিম। (৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়েত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেন নি—যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দ্রুত কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়ে, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন ; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন—যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহ্‌র কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের

মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫০) তারা কি জাহিলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?

যোগসূত্র ঃ আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার সপ্তম রুকূ। এতে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ বিষয়টিই সূরা মায়েদার প্রথম থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাঁর প্রেরিত বিধি-বিধানের পরিবর্তন-পরিবর্ধন---যা ইহুদী ও খৃস্টানদের চিরাচরিত বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

এ রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতের অধিকারী ইহুদীদেরকে সম্বোধন করে তাদের এ অবাধ্যতা ও তার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে প্রথম দুই আয়াতে সতর্ক করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'কিসাস' সম্পর্কে কতিপয় বিধান উল্লেখ করেছেন। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, তা কিসাস সম্পর্কেই ছিল অর্থাৎ বনী নুযায়র রক্ত বিনিময় ও কিসাসের ব্যাপারে সমতায় বিশ্বাসী ছিল না, বরং বনী কুরায়যাকে নিজেদের চাইতে কম রক্ত-বিনিময় গ্রহণ করতে বাধ্য করত। এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে নিজেদের আইন প্রয়োগ করার জন্য ইহুদীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে, তাদেরকে কাফির ও জালিম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে ইঞ্জীলধারী খৃস্টানদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে অন্য আইন প্রয়োগ করার কারণে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করে তাদেরকে উদ্ধত ও অবাধ্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে মুসলমানদের এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আহলে-কিতাবদের এ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে এবং নাম-যশ ও অর্থের লোভে যেন আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পরিবর্তন না করে অথবা আল্লাহ্ প্রদত্ত আইনের বিরুদ্ধে স্বরচিত আইন যেন প্রয়োগ না করে।

এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। তা এই যে, মৌলিক বিশ্বাস ও ইবাদতের ব্যাপারে যদিও সব পয়গম্বর একই পথের অনুসারী, কিন্তু আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক পয়গম্বরকে তাঁর যমানার উপযোগী শরীয়ত দান করা হয়েছে, যাতে অনেক শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্নতর রাখা হয়েছে। আয়াতে আরো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরকে প্রদত্ত শরীয়ত তাঁর আমলে উপযোগী ও অবশ্য পালনীয় ছিল এবং যখন তা রহিত করে অন্য শরীয়ত আনা হল, তখন তা-ই উপযোগী ও অবশ্য-পালনীয় হয়ে গেছে। এতে শরীয়তসমূহের বিভিন্নতা ও পরিবর্তিত হতে থাকার একটি বিশেষ রহস্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি [মূসা (আ)-র প্রতি] তওরাত অবতরণ করেছি—যাতে (বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও)

নির্দেশ রয়েছে এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও) বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। (বনী ইসরাইলের) পয়গম্বরগণ, যাঁরা (লাখো মানুষের অনুসরণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ছিলেন, এ (তওরাত) অনুযায়ী ইহুদীদের ফয়সলা দিতেন এবং (এমনিভাবে তাদের) আল্লাহ্ওয়ালা আলিমরাও (এ তওরাত অনুযায়ীই ফয়সালা দিতেন। কারণ, এটিই ছিল তখনকার শরীয়ত)। কেননা তাদেরকে (অর্থাৎ সে আলিমদের) আল্লাহ্র এ গ্রন্থের (উপর আমল করাতে এবং অন্যান্যকে আমল করানোর ব্যাপারে) দেখাশোনা করতে নির্দেশ (পয়গম্বরদের মাধ্যমে) দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর (অর্থাৎ আমল করানোর) অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা সে নির্দেশ কবূল করেছিলেন। এ কারণে তারা সর্বদাই এ নির্দেশ অনুসরণ করে চলতেন।) অতএব, (হে এ যুগের অংশগ্রহণকারী ইহুদী সর্দার ও আলিমকুল ! তোমাদের অনুসৃতরা যখন সর্বদাই তওরাত মেনে এসেছেন, তখন) তোমরাও (মুহাম্মদের রিসালতের সত্যায়নের ব্যাপারে---যার নির্দেশ তওরাতেও রয়েছে) লোকদের থেকে (এ) আশংকা করো না (যে আমরা সত্যায়ন করলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমাদের জাঁকজমক বিলীন হয়ে যাবে)! আর (শুধু) আমাকেই ভয় কর (অর্থাৎ সত্যায়ন না করলে আমার শাস্তিকে ভয় কর) এবং আমার নির্দেশাবলীর বিনিময়ে (জাগতিক) স্বল্পমূল্য (যা তোমরা জনগণের কাছ থেকে পেয়ে থাক, গ্রহণ করো না। (কেননা, জাঁকজমক ও অর্থের লিপ্সাই তোমাদেরকে সত্যায়ন না করতে উদ্বুদ্ধ করে)। এবং (স্মরণ রেখো) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, (বরং শরীয়তের ফয়সালা নয়---এমন বিষয়কে শরীয়তের ফয়সালা বলে চালিয়ে দেয়,) সে সম্পূর্ণ কাফির। (হে ইহুদীগণ! তোমরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও স্বীয় বিশ্বাসকে রিসালতে মুহাম্মদিয়ার বিশ্বাসের অনুরূপ এবং কর্মক্ষেত্রেও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা ইত্যাদি নির্দেশ, স্বীয় মনগড়া নির্দেশকে আল্লাহ্র নির্দেশ বলে পথভ্রষ্ট করার দুষ্কর্মে লিপ্ত রয়েছ।) এবং আমি এদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) প্রতি তাতে (অর্থাৎ তওরাতে) ফরয করেছিলাম যে, (যদি কাউকে অন্যায়ভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা অথবা আহত করে এবং হকদার যদি দাবী করে, তবে) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) বিশেষ জখমেরও বিনিময় রয়েছে। অতঃপর যে ব্যক্তি (এ কিসাস অর্থাৎ বিনিময় গ্রহণের অধিকারী হয়েও) তা (অর্থাৎ কিসাস ক্ষমা করে দেয়,) তার (অর্থাৎ ক্ষমাকারীর) জন্য (তার গোনাহ্সমূহের) প্রায়শ্চিত্ত (অর্থাৎ গোনাহ্ মোচন) হওয়ার কারণ হয়ে যাবে। (অর্থাৎ ক্ষমার কারণে সে সওয়াবের অধিকারী হবে।) বস্তুত (ইহুদীরা যেহেতু এসব বিধি-বিধান ত্যাগ করেছিল, তাই পুনরায় বলা হচ্ছে ঃ আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন, যারা তদনুযায়ী ফয়সালা করে না (যার অর্থ উপরে বর্ণিত হয়েছে, তারাই পুরোপুরি জুলুম করছে। অর্থাৎ বড়ই মন্দ কাজ করছে।) আর আমি এ সবের (অর্থাৎ এসব পয়গম্বরের) পেছনে (যাদের উল্লেখ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ বাক্যে হয়েছে)

ঈসা ইবনে মরিয়মকে এ অবস্থায় (পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়ন করতেন--সকল ঐশী গ্রন্থের সত্যায়ন করা প্রত্যেক রিসালতের অপরিহার্য

রীতি।) এবং আমি তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে (তওরাতের মতই বিশুদ্ধ বিশ্বাসেরও) নির্দেশ ছিল এবং (কর্মগত বিধি-বিধানেরও বিস্তারিত বর্ণনা ছিল এবং) তা (ইঞ্জীল) পূর্ববর্তী গ্রন্থ (অর্থাৎ) তওরাতের সত্যায়ন (ও) করত (যা করা প্রত্যেক ঐশী গ্রন্থের জন্য অপরিহার্য।) এবং তা নিছক হিদায়েত ও উপদেশ ছিল আল্লাহ্-ভীরুদের জন্য। বস্তুত (ইঞ্জীল প্রদান করে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে,) ইঞ্জীলধারীদের উচিত আল্লাহ্ তাতে যা অবতারণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করা এবং (হে এ যুগের খৃস্টানরা! শুনে রাখ,) যারা আল্লাহ্ যা অবতারণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই সম্পূর্ণ দুষ্কর্মী। (ইঞ্জীলও যে রিসালতে-মুহাম্মদীর খবর দিচ্ছে--অতএব, তোমরা এর বিরুদ্ধাচরণ করছ কেন?) আর (তওরাত ও ইঞ্জীলের পর) আমি এ (কোরআন নামক) গ্রন্থ আপনার কাছে প্রেরণ করেছি, যা স্বয়ং সত্যতা গুণে গুণান্বিত এবং পূর্ববর্তী যেসব (ঐশী) গ্রন্থ (এসেছে যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবূর) সে সবেরও সত্যায়ন করে (যে সেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।) এবং (কোরআন নামক গ্রন্থটি যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত ও পালনীয় এবং এতে উপরোক্ত ঐশী গ্রন্থসমূহের সত্যতার সাক্ষ্যও রয়েছে, তাই এ গ্রন্থ) ঐসব গ্রন্থের (সত্যতার চির) সংরক্ষক। (কেননা, ঐসব গ্রন্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ---এ বিষয়বস্তুটি কোরআনে চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে। কোরআন যেহেতু এমন গ্রন্থ,) অতএব তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে (যদি আপনার এজলাসে উপস্থিত হয়,) আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সত্য গ্রন্থ এসেছে, তা থেকে সরে গিয়ে তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির অনুসরণ (ভবিষ্যতেও) করবেন না; (যেমন তাদের অনুরোধ ও আবেদন সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আপনি পরিষ্কার অস্বীকার করে এসেছেন। অর্থাৎ আপনার সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক। সর্বদা এ সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। হে আহলে-কিতাবগণ! এ কোরআনকে সত্য জানতে এবং এর ফয়সালা মেনে নিতে তোমরা অস্বীকার করছ কেন? নতুন ধর্মের আগমন কি কোন আশ্চর্যের বিষয়? ঐ ধারা তো পূর্ব থেকেই চলে আসছে) তোমাদের প্রত্যেকের (অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের) জন্য (ইতিপূর্বে) আমি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ তরীকত নির্ধারণ করেছিলাম। (উদাহরণত ইহুদীদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল তওরাত আর খৃস্টানদের শরীয়ত ও তরীকত ছিল ইঞ্জীল। অতএব, উম্মতে-মুহাম্মদীর জন্য যদি শরীয়ত ও তরীকত কোরআনকে নির্ধারণ করা হয়, যার সত্যতা যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত, তবে একে অস্বীকার করছ কেন?) আর যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সবার জন্য এক তরীকা রাখতে চাইতেন,) তবে (তা করারও শক্তি তাঁর ছিল যে,) তোমাদের সবাই (অর্থাৎ ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের একই শরীয়ত দিয়ে) একই উম্মত করে দিতেন (এবং নতুন শরীয়ত আগমন করত না, যা দেখে তোমরা পলায়নপর)। কিন্তু (স্বীয় রহস্যের কারণে তিনি) এরূপ করেন নি (বরং প্রত্যেক উম্মতের জন্য পৃথক পৃথক তরীকা দিয়েছেন) যাতে তোমাদের (প্রতি যুগে নতুন নতুন) যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের সবার (আনুগত্য প্রকাশের জন্য) পরীক্ষা নেন। (কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নতুন তরীকা দেখলেই পলায়নের মনোভাব ও বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, কিন্তু যারা বিশুদ্ধ বিবেকের অধিকারী এবং ন্যায়ের প্রতি নিষ্ঠাবান, তারা সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর স্বীয় মনকে সত্যের পক্ষ অবলম্বন

করতে বাধ্য করে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট পরীক্ষা। অতএব, এজন্য যদি একই শরীয়ত হত, তবে সে শরীয়তের সূচনাকালে যারা বিদ্যমান থাকত, তাদের পরীক্ষা অবশ্য হয়ে যেত, কিন্তু তাদের অনুগামী ও এ তরীকায় অভ্যস্ত অন্যান্য লোকের পরীক্ষা হত না। কিন্তু এখন প্রত্যেক উম্মতের পরীক্ষা হয়ে গেছে। আরেক ধরনের পরীক্ষা এই যে, নিষিদ্ধ তরীকার প্রতি মানুষের লোভ সহজাত। একাধিক শরীয়তের আকারে এ পরীক্ষা অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে থাকে। কারণ এ ক্ষেত্রে রহিত শরীয়তের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়। এ শরীয়তের আকারে গোনাহ্ থেকে নিষেধ করা যেত, কিন্তু এক্ষেত্রে সত্য-অসত্যের প্রশ্ন নেই। তাই পরীক্ষা তেমন প্রাণবন্ত হত না। প্রত্যেক উম্মতের পূর্ববর্তী লোকরা বিশেষভাবে প্রথম ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। কাজেই উভয় ধরনের পরীক্ষার সমষ্টির সম্মুখীন হয় সবাই—পূর্ববর্তীরাও এবং পরবর্তীরাও। সুতরাং নতুন শরীয়ত আগমনের মধ্যে যখন এ রহস্য নিহিত,) অতএব (বিদ্বেষ ত্যাগ করে) কল্যাণকর বিষয়ের দিকে (অর্থাৎ কোরআনে উল্লেখিত ধর্মীয় বিশ্বাস, সৎকর্ম ও নির্দেশাবলীর দিকে) ধাবিত হও। (অর্থাৎ কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী জীবন যাপন কর। একদিন) তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের সবাইকে অবহিত করবেন, যে বিষয়ে তোমরা (সত্য দেদীপ্যমান হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে অনর্থক) মতবিরোধ করতে। (তাই এ অনর্থক মতবিরোধ ছেড়ে সত্যকে যা এখন কোরআনেই সীমাবদ্ধ, গ্রহণ করে নাও) আর (যেহেতু সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও আহলে-কিতাবরা আপনার কাছে মনমত মোকদ্দমা মীমংসা করিয়ে নেওয়ার আবেদন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে, তাই তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্য এবং এ কথা শুনিয়ে তাদেরকে চিরতরে নিরাশ করে দেওয়ার জন্য আমি (পুনরায়) আদেশ করেছি যে, আপনি তাদের (অর্থাৎ আহলে-কিতাবদের) পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে (যদি তা আপনার এজলাসে উপস্থিত হয়) প্রেরিত এ গ্রন্থ অনুযায়ী মীমাংসা করুন এবং তাদের (শরীয়ত বিরোধী) প্রবৃত্তির (ও ফরমায়েশের ভবিষ্যতেও) অনুসরণ করবে না (যেমন এ পর্যন্ত করেন নি)। আর তাদের থেকে (অর্থাৎ তাদের এ বিষয় থেকে ভবিষ্যতেও পূর্বের ন্যায়) সতর্ক হোন---যেন তারা আল্লাহ্ প্রেরিত কোন নির্দেশ থেকে আপনাকে বিচ্যুত না করে (এরূপ সম্ভাবনা অবশ্য নেই ; তবুও এ ব্যাপারে সজাগ থাকলেও সওয়াব পাওয়া যাবে।) অনন্তর (কোরআন সুস্পষ্ট ও তার ফয়সালা সত্য হওয়া সত্ত্বেও) যদি তারা (কোরআন থেকে এবং আপনার কোরআনভিত্তিক ফয়সালা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিশ্চিত জানুন যে, তাদের কোন কোন অপরাধের জন্য আল্লাহ্ (দুনিয়াতেই) তাদেরকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন। আর কোন কোন অপরাধ হচ্ছে ফয়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। কোরআনকে সত্য বলে স্বীকার না করার শাস্তি পরকালে পাবে। কেননা, প্রথম অপরাধ যিম্মি হওয়ার পরিপন্থী এবং দ্বিতীয় অপরাধ ঈমান বিরোধী অপরাধের শাস্তি হয় পরকালে। সেমতে ইহুদীদের ঔদ্ধত্য ও অঙ্গীকার বিরোধিতা যখন সীমা অতিক্রম করে, তখন তাদেরকে হত্যা, জেল, নির্বাসন ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হয়। এবং [হে মুহাম্মদ (সা) তাদের এসব কুকাণ্ড দেখেশুনে আপনি অবশ্যই ব্যথিত হবেন, কিন্তু আপনি বেশী চিন্তিত হবেন না ; কেন না] অনেক মানুষই তো (জগতে সবর্দাই) দুষ্কর্মী হয়ে থাকে। তবে কি তারা (কোরআনের ফয়সালা থেকে—যা নিঃসন্দেহ ন্যায়বিচারভিত্তিক মুখ ফিরিয়ে) জাহিলিয়াত আমলের

ফয়সালা কামনা করে। (যা তারা ঐশী শরীয়তের বিপক্ষে নিজেরা রচনা করেছিল? এ রুকূর পূর্ববর্তী দুটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ আয়াতের ভূমিকায় এর উল্লেখ হয়ে গেছে। অথচ সে ফয়সালা ন্যায়বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অর্থাৎ জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া এবং অজ্ঞতা কামনা করা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে)। এবং আল্লাহ্ অপেক্ষা কে উত্তম ফয়সালাকারী হবে? (বরং তাঁর সমান ফয়সালাকারীও কেউ নেই। সুতরাং আল্লাহ্র ফয়সালা ছেড়ে অন্যের ফয়সালা কামনা করা মূর্খতা নয় তো কি? কিন্তু এ বিষয়টিও) বিশ্বাসী (ও ঈমানদার) সম্প্রদায়ের (ই) মতে। (কেননা, এ বিষয়টি বুঝতে হলে সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি অপরিহার্য অথচ কাফিরদের মাথায় আর যাই থাক সুস্থ জ্ঞানবুদ্ধি নেই)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ অর্থাৎ আমি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী ইসরাঈলের জন্য পথ প্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

অর্থাৎ তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ্ওয়ালা ও আলেমরা সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিদের দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ رَبَّانِيُّونَ এবং দ্বিতীয় ভাগ أَحْبَارُ — رَبَّانِيُّ শব্দটি رب-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্ ওয়ালা (আল্লাহ্ভক্ত)। احبار শব্দটি حبر -এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলিমকে حبر বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলিমও হবেন। নতুবা ইল্ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ভক্ত

হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই আলিম, যে ইল্‌ম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলিম আল্লাহ্‌র বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ্ ও রসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভক্তই আলিম এবং প্রত্যেক আলিমই আল্লাহ্‌ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্‌ভক্ত ও আলিমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্য অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশীর ভাগ ইবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু ইল্‌ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয়, তাকে 'রব্বানী' অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশিদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে-মোয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল ইবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে حبر বা আলিম বলা হয়।

মোট কথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলিম ও মাশায়েখের মৌলিক অভিন্নতাও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলিম-সূফী দুটি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যত পৃথক পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর ইরশাদ হয়েছেঃ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ অর্থাৎ এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ আলিম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওরাতের হেফাযত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম ও তাঁদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা, যাঁরা এর হেফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছেঃ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সা)-র আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থলিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসূলে করীম (সা)-কে

সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পেছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয় যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোট অংকের ঘুষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেওয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্য বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে অথবা শত্রু হয়ে যাবে! তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফির ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কিসাসের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ -

অর্থাৎ আমি ইহুদীদের জন্য তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ যখমেরও বিনিময় রয়েছে।

বনী কুরায়যা ও বনী নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী নুযায়র গায়ের জোরে বনী কুরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেওয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী কুরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে কিসাস নয়, শুধু রক্ত বিনিময় দেওয়া হবে। তাও বনী নুযায়রের রক্ত বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ জাহিলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতেও কিসাস ও রক্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্য নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ—অর্থাৎ যারা আল্লাহ্-প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালিম, আল্লাহ্র বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতের প্রথমে হযরত ঈসা (আ)-র নবুয়ত প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষক ঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতারণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত-ইঞ্জীলের সত্যায়ন করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে। কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী (সা)-কে তওরাতধারী ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্-প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুঁশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলিম মহানবী (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানেন আমরা ইহুদীদের আলিম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে, আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্ তা'আলা হুযুর (সা)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্-প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দেবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না—এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

পয়গম্বরগণের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া আলায়হিমুস সালাম যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, সহীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْمَا اٰتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ -

অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্ম-পন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশ-সমূহে কিছু প্রভেদ রয়েছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্য একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেন নি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা ইবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্য সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন নতুন গ্রন্থ ও শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসাবে আঁকড়ে থাকে---এর বিপক্ষে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট তাৎপর্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে ইবাদত ও দাসত্বের এ-রূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য-অনুসরণকেই ইবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকর ও তিলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য। এ কারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে সওয়াব তো দূরের কথা, উল্টা পাপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ সময়ে রোযা রাখা নিশ্চিত গোনাহ্। ৯ই যিলহজ্ব ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও ইবাদত করা বিশেষভাব কোন সওয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এটি সর্ববৃহৎ ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ ততক্ষণই তা ইবাদত এবং যখন ও যেখানে নিষেধ করা হয় তখন সেখানে তাই হারাম ও না-জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ

এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব ইবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা ইবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্র পথেই বিদ'আত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তা-ই। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক প্রকার ইবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেওয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের পার্থক্যের আর একটি বড় তাৎপর্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের, প্রত্যেক স্তরের মানুষের মন-মেজায ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্য শাখাগত বিধান এক করে দেওয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আল্লাহ্র রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মনসূখ' (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশত কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন পরে হুঁশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসূখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করেন। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিনদিন এ ঔষধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ঔষধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রটি নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সার-সংক্ষেপ ঃ (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সা) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন, ইহুদীদের মোকদ্দমায় কিসাসের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতেও ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে যখমের কিসাস সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে

বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ্ (সা) জারি করেছেন। এ কারণেই আলিমদের মতে বিগত শরীয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদের তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সা)-র আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ্র প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়--এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যত বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম--বিশেষত আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান এবং এ পার্থক্য বিরাট তাৎপর্যের উপর নির্ভরশীল।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا
يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى
ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟
فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ
أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ
فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن
دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ ۙ أَذِلَّةٍ عَلَى
ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ يُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا
وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾

(৫১) হে মু'মিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুত যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশংকা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন—ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেই সব লোক, যারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে অচিরে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ—তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মু'মিনবৃন্দ—যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী। হে মু'মিনগণ, আহলে-কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নামাযের জন্য আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ.

উল্লিখিত আয়াতসমূহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়বস্তু বিবৃত হয়েছে। এগুলোই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূল ভিত্তি।

(এক) মুসলমানরা অমুসলিমদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, ন্যায়বিচার, অনুগ্রহ ও সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং করাও উচিত। কারণ, ইসলামের শিক্ষা তা-ই— কিন্তু তাদের সাথে এমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করার অনুমতি নেই, যার ফলে ইসলামের স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণসমূহ মিশ্রিত হয়ে যায়। এ প্রশ্নটিই 'অসহযোগ' নামে খ্যাত। (দুই) যদি কখনও কোথাও মুসলিমরা এ মৌলিক নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অমুসলিমদের সাথে উপরোক্ত-রূপে মেলামেশা করে, তবে মনে করার কোন কারণ নেই যে, এতে ইসলামের কোনরূপ ক্ষতি হবে। কেননা, ইসলামের হিফাযত ও স্থায়িত্বের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। ইসলামকে কেউ ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না। মনে করুন, যদি কোন সম্পদায় শরীয়তের সীমা লংঘন করে ইসলামকেই পরিত্যাগ করে বসে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটাবেন, যারা ইসলামের মূলনীতি ও আইন প্রতিষ্ঠা করবে।

(তিন) যখন নেতিবাচক দিকটি জানা হয়ে গেল, তখন মুসলিমদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রসূল এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথেই হতে পারে। এ হচ্ছে উপরোক্ত পাঁচটি আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ। এবার আয়াত-গুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেখুন।

হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা (মুনাফিকদের মত) ইহুদী ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা (নিজেরাই) একে অপরের বন্ধু। (অর্থাৎ ইহুদীরা পরস্পর এবং খৃস্টানরা পর-স্পর বন্ধু। উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধুত্ব সামঞ্জস্যের কারণেই হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রয়েছে, কিন্তু তোমাদের সাথে কি সামঞ্জস্য?) এবং (যখন জানা গেল যে, সামঞ্জস্যের কারণে বন্ধুত্ব হয়, তখন) তোমাদের মধ্য থেকে যে লোক তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে (বিশেষ কোন সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। (বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (এ বিষয়ের) জ্ঞানই দেন না, যারা (কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে,) নিজেদের ক্ষতি সাধন করছে (অর্থাৎ বন্ধুত্বে মগ্ন থাকার কারণে বিষয়টি তাদের বুঝেই আসে না। যেহেতু তারা বিষয়টি বুঝে না,) তাই (হে দর্শকবৃন্দ,) তোমরা এমন লোকদের, যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে দেখবে যে দৌড়ে গিয়ে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) মধ্যে প্রবেশ করে; (কেউ তিরস্কার করলে বাহানাবাজি করে) বলে ঃ (তাদের সাথে আমাদের মেলামেশা আন্তরিক নয়, বরং আন্তরিকভাবে আমরা তোমাদের সাথেই আছি, শুধু একটি কারণে তাদের সাথে মেলামেশা করি। তা এই যে,) আমাদের আশংকা হয় যে, (কালের আবর্তনে)

আমরাও না কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই—(যেমন দুর্ভিক্ষ, অভাব-অনটন। এসব ইহুদী আমাদের মহাজন। তাদের কাছে ধার-কর্জ চাওয়া যায়। বাহ্যিক মেলামেশা বন্ধ করে দিলে প্রয়োজন মুহূর্তে আমরা বিপদে পড়ব। তারা বাহ্যত نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَآئِرَةٌ বাক্যের এ অর্থই বর্ণনা করত। কিন্তু মনে মনে ধারণা করত যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিররা জয়ী হয়ে গেলে প্রাণ রক্ষার জন্য তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখাই দরকার।) অতএব, নিকটবর্তী আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের (ঐ সব কাফিরদের বিরুদ্ধে) পরিপূর্ণ বিজয় দান করবেন (যাদের সাথে তারা বন্ধুত্ব করে---যাতে মুসলিমদের চেষ্টাও সক্রিয় থাকবে) অথবা অন্য কোন বিষয় নিজের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে (প্রকাশ করবেন অর্থাৎ ওহীর মাধ্যমে) নির্দিষ্ট করে দেবেন, (যাতে মুসলিমদের চেষ্টা কোনভাবে সক্রিয় থাকবে না। উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিমদের বিজয় এবং মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন দুটিই অচিরে হবে।) অতঃপর (তখন তারা) স্বীয় (পূর্ববর্তী) গোপন মনোভাবের জন্য অনুতপ্ত হবে (যে, হায় আমরা তো মনে করতাম, কাফিররাই জয়ী হবে, এখন দেখি ব্যাপার উল্টো হয়ে গেছে। একে তো নিজেদের মনোভাবের ভ্রান্ততার কারণে অনুতাপ হবে যা স্বাভাবিক, দ্বিতীয়ত অনুতাপ হবে মুনাফিকদের কারণে---যদ্দরুন আজ অপমানিত হয়েছে। উভয়বিধ অনুতাপই مَآ اَسَرُّوْا বাক্যে অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় অনুতাপ এ কারণে হবে যে, কাফিরদের সথেও বন্ধুত্ব নিষ্ফল হল এবং মুসলমানদের সাথেও সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গেল। مَآ اَسَرُّوْا বাক্যের উপর যেহেতু বন্ধুত্ব নির্ভরশীল ছিল। তাই উপরোক্ত দুটি অনুতাপ উল্লেখ করার দরুন তৃতীয় অনুতাপ আপনাআপনিই বোঝা যাচ্ছে।) এবং (যখন এ বিজয়কালে তাদের মুনাফিকী প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন পরস্পর) মুসলমানরা (অবাক হয়ে) বলবেঃ আরে এরাই কি তারা---যারা খুব জোরেশোরে (আমাদের সামনে) প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা (আন্তরিকভাবে) তোমাদের সাথে আছি (এখন তো অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ) তাদের কৃতকর্মসমূহ (অর্থাৎ উভয়পক্ষের নিকট সাধু সাজার অপচেষ্টা) ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে (উভয় পক্ষ থেকেই) বিফল মনোরথ হয়েছে। (অর্থাৎ কাফিররা পরাজিত হওয়ার কারণে তাদের সাথেও বন্ধুত্ব নিষ্ফল হয়েছে এবং অপরদিকে মুসলমানদের সামনে মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়ায় তাদের কাছেও সাধু সাজা কঠিন। অতএব, উভয় কুলই গেল।) হে বিশ্বাসিগণ, (অর্থাৎ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যারা বিশ্বাসী) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বীয় (এ) ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, তবে তাতে (ইসলামের কোন ক্ষতি নেই; কেননা ইসলামের কাজ সম্পাদন করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা অচিরে (তাদের স্থলে এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে; মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, (অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে) আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে এবং (ধর্ম ও জিহাদের ব্যাপারে) তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। (মুনাফিকদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা

চুপিচুপি জিহাদের জন্য যেত কিন্তু আশংকা করত যে, আন্তরিক বন্ধু কাফিররা এতে তিরস্কার করবে ; কিংবা ঘটনাক্রমে যদি বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেই জিহাদ হয়, তবে যে-ই দেখবে এবং শুনবে, সে-ই বলবে যে, এমন আপন লোকদের মারতে গিয়েছিলে ?) এগুলো (অর্থাৎ উল্লিখিত গুণাবলী) আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ---তিনি যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত প্রশস্ত--(ইচ্ছা করলে সবাইকে এসব গুণ দান করতে পারেন, কিন্তু) মহাজ্ঞানী (-ও বটে। তাই তাঁর জ্ঞানমতে যাকে দেওয়া সমীচীন তাকে দেন)। তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ যাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্ব রাখা উচিত, তারা হচ্ছেন) আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর রসূল (সা) এবং সে, বিশ্বাসীবৃন্দ, যারা নামায প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত দান করে এবং (যাদের অন্তরে) নম্রতা বিরাজমান থাকে। (অর্থাৎ বিশ্বাস, চরিত্র, শারীরিক ও আর্থিক সৎকর্ম ইত্যাদি সব গুণে তারা গুণান্বিত।) এবং যে ব্যক্তি (উল্লিখিত বিষয়বস্তু অনুযায়ী) আল্লাহ্, রসূল এবং বিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, (সে আল্লাহ্র দলভুক্ত হয়ে যায় এবং) আল্লাহ্র দল অবশ্যই বিজয়ী (আর কাফিররা হল পরাজিত। অতএব, পরাজিতকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা মোটেই শোভনীয় নয়)। হে বিশ্বাসিগণ, যারা তোমাদের পূর্বে (ঐশী) গ্রন্থ (অর্থাৎ তওরাত, ইঞ্জিল) প্রাপ্ত হয়েছে (অর্থাৎ খৃস্টান ও ইহুদী), যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে রেখেছে (যা মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই লক্ষণ), তাদেরকে এবং (এমনিভাবে) অন্যান্য কাফিরকে (ও ; যেমন মুশরিকদের) বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (কেননা, আসল কারণ---কুফর ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান।) আর আল্লাহ্ তা আলাকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (অর্থাৎ বিশ্বাসী তো আছই। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা যে কাজে নিষেধ করেন, তা করো না।) এবং (তারা যেমন ধর্মের মূলনীতি নিয়ে উপহাস করে, শাখা নিয়েও করে। সেমতে) তোমরা যখন নামাযের জন্য (আযানের মাধ্যমে) ঘোষণা কর, তখন তারা (তোমাদের) এ ইবাদতকে (নামায ও আযান উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত) উপহাস ও খেলা মনে করে (এবং) এর (অর্থাৎ এমন করার) কারণ এই যে, তারা সম্পূর্ণ নির্বোধ সম্প্রদায় (নতুবা সত্যকে তারা বুঝত এবং তা নিয়ে উপহাস করত না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খৃস্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খৃস্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সেই সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

শানে নযুল ঃ তফসীরবিদ ইবনে জারীর ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলুল্লাহ্

(সা) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না; বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম বিদ্বেষের কারণে বেশি দিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ্ (সা) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের জন্য গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ গ্রহণ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে সামেত প্রমুখ সাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সম্পর্কছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশংকা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরিক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল এ কারণেই বলল ঃ এদের সাথে সম্পর্কছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হল ঃ

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰى اَنْ تُصِيْبَنَا دَائِرَةٌ ـ

অর্থাৎ অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফির বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল ঃ এদের সাথে সম্পর্কছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশংকা রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এর উত্তরে বলেন ঃ

فَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِىَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى

مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ -

অর্থাৎ এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরিক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্য অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবেঃ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত? আজ এদের সব লোকদেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয় ও মুনাফিকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্য ধর্ম ইসলামের হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না—হতে পারে না। কারণ, এর হিফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হিফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ্ তা'আলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচেগলে মাটি হতে থাকে। কবি চমৎকার বলেছেন ঃ

ان المقادير اذا ساعدت
الحقت العاجز بالقادر

অর্থাৎ ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন অক্ষম ও অকর্মণ্য ব্যক্তি দ্বারা সক্ষম ও বলিষ্ঠ ব্যক্তির কাজ উদ্ধার করে নেয়।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসবে। এ গুণই দুই অংশে বিভক্ত ঃ

(এক) আল্লাহ্‌র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন-না-কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণত আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি মানুষের মনে তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নিয়ামতের ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহ্‌র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যত মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শোনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা আলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ হে রসূল, আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা। এমন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নত বিরোধী কাজকর্ম ও বিদ'আত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

উপরোক্ত জাতির দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ اَذِلَّةٍ عَلَى

الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ---এখানে اَذِلَّةٌ শব্দটি কামূস অভিধানের বর্ণনানুযায়ী ذليل কিংবা ذلول শব্দের বহুবচন হতে পারে। আরবী ভাষায় ذليل শব্দের অর্থ তা-ই, যা উর্দু ইত্যাদি ভাষায় প্রচলিত রয়েছে---অর্থাৎ 'হীন'। ذلول শব্দের অর্থ নম্র ও সহজসাধ্য ; যাকে সহজে বশ করা যায়। তফসীরবিদগণের মতে আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

انا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق

অর্থাৎ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোট কথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে أَعِزَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز-এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর দীনের শত্রুদের মুকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্র করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্তা ও সত্তাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও দীনের খাতিরে নিবেদিত। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগতদের দিকে নয় ; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাত্হে উল্লিখিত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তা-ই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ অর্থাৎ তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্য শুধু কতিপয় প্রচলিত ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্য চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমত, বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়ত, আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না--জেল-জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টা-চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হিফাযত ও সমর্থনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী একটি দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহত-কারী দলের জন্য একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের সেই দল, যারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর ডাকে বজ্র-কঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই ঃ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযার মহানবী (সা)-র সাথে নবুও-য়তে অংশীদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী (সা)-র দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে ঃ যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর (সা) তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

এমনিভাবে ইয়ামানে মুযহাজ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে দমন করার জন্য ইয়ামানে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষদিকে সাহাবায়ে-কিরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদ নবুয়ত দাবী করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হুযুরে-আকরাম (সা)-এর রোগ-শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্ম-ত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্ম-ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুযুর (সা)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিয়োগ-ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর যে

বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মুকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সাহাবায়ে-কিরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। সাহাবায়ে-কিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে--এমন আশংকাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জিহাদের জন্য পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে-কিরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জিহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন ঃ

"'যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জ্বিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জিহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন সাহাবায়ে-কিরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন।

এ কারণেই হযরত আলী মুর্তযা (রা), হাসান বসরী (র), যাহ্হাক (র) প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না ; অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ও অন্যান্য সাহাবায়ে-কিরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোট কথা সাহাবায়ে-কিরামের একটি দল খলীফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রা)-র হাতে নিহত হল এবং তাঁর দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়ায়লিদের মুকাবিলায়ও হযরত খালিদ (রা)-ই গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ্

তা'আলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খিলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আ'নাসীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়-বার্তা, যা চরম সংকট মুহূর্তে খলীফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকার-কারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি রণাঙ্গনে সাহাবায়ে-কিরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (নিশ্চয় আল্লাহ্ভক্তদের দলই বিজয়ী।) আল্লাহ্ তা'আলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবী-বাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সা)-র ওফাতের পর আরবে ধর্ম ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মুকাবিলার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে-কিরাম—তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবূ বকর (রা) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ—

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়ত, তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়ত, তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফিরদের বেলায় কঠোর।

চতুর্থত, তাঁদের জিহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্র পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেন নি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথা-সময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জিহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হবে না, বরং এ সবই আল্লাহ্ তা আলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদের কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে প্রমাণিত সত্য হিসাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা ও অতঃপর তাঁর রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলারই সম্পর্ক, পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়—সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ—প্রথমত, তারা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়ত, স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়ত, তারা বিনম্র ও বিনয়ী, স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য—وَهُمْ رَاكِعُوْنَ-এ رُكُوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূর অর্থ পারিভাষিক রুকূ, যা নামাযের একটি রোকন। يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ-এর পর وَهُمْ رَاكِعُوْنَ—বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিন্ন রূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী ও খৃস্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকূ নেই। রুকূ একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। ---(মাযহারী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে 'রুকু' শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ নত হওয়া, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে আবূ হাইয়ান এবং কাশ্‌শাফ গ্রন্থে যামাখশারী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্য গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এ বাক্যটি হযরত আলী (রা)-র বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রা) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকূতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মেটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলিম ও হাদীসবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের পাবন্দী করে। বস্তুত তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রা) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

من كنت مولاه فعلى مولاه অর্থাৎ আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ اللهم وال من والاه وعاد من عاداه অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আলীকে যে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, আপনি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন এবং আলীর সাথে যে শত্রুতা করে, আপনি তাকে শত্রু মনে করুন।

হযরত আলী (রা)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবত এই যে,

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রা)-র শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের পরবর্তীকালে তা-ই-প্রকাশ পেয়েছে।

মোট কথা আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক। সাহাবায়ে কিরাম এবং সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রা)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রা)-কে বোঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনিও আয়াতের লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্-রসূল ও মুসলমানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ -

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্র দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলীফার বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর মুকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কিস্রা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলীফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্র এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে তাকীদের জন্য রুকূর শুরু ভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত ঃ (এক) আহ্লে-কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফির ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবূ হাইয়্যান বাহ্‌রে-মুহীত গ্রন্থে বলেন ঃ كفار শব্দে আহ্‌লে-কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহ্‌লে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা অন্যান্য কাফিরদের তুলনায় যদিও বাহ্যত ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (স)-র আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফিরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহ্‌লে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা আল্লাহ্‌র ধর্ম ও ঐশী গ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহংকারই তাদেরকে সত্য ধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا—অর্থাৎ মুসলমান যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাসা করে। তফসিরে মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ মদীনায় জনৈক খৃস্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যটি শুনত, তখন বলত اَحْرَقَ اللّٰهُ الْكَاذِبَ অর্থাৎ আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবারের পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাতে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজনবশত আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এ সময় সবাই নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে মারা গেল।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ—অর্থাৎ সত্য ধর্মের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে

নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ---হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

অর্থাৎ তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বুঝে, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝
قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۭ مَنْ
لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ
وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ عَنْ سَوَاۗءِ
السَّبِيْلِ ۝ وَاِذَا جَاۗءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَقَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ
وَهُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ۭ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝

(৫৯) বলুন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এ ছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্‌র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্‌র কাছে ? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ্ তা খুব জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে রসূল,) আপনি বলে দিন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা আমাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কি দোষ পাও যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের কাছে

প্রেরিত কোরআনের প্রতি এবং ঐ গ্রন্থের প্রতি (ও) যা (আমাদের) পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল (অর্থাৎ তোমাদের গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীল)। এ সত্ত্বেও যে তোমাদের অধিকাংশ লোক ঈমান থেকে বিচ্যুত (অর্থাৎ তারা না কোরআনে বিশ্বাস করে, আর না তওরাত ও ইঞ্জীলে বিশ্বাস করে। যা তারা স্বীকার করে কেননা, এগুলোতে বিশ্বাস থাকলে এগুলোতে রসূলুল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার যে নির্দেশ রয়েছে তাতে অবশ্যই বিশ্বাস থাকত। কোরআনকে অস্বীকার করাই সাক্ষ্য দেয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীলেও তাদের বিশ্বাস নেই। এ হচ্ছে তোমাদের অবস্থা। কিন্তু আমরা এর বিপরীতে সব গ্রন্থেই বিশ্বাস করি। অতএব চিন্তা কর, দোষ আমাদের নয়— তোমাদের)। এবং আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, (যদি এতেও তোমরা আমাদের তরীকাকে মন্দ মনে কর, তবে এস) আমি কি (ভালমন্দ যাচাই করার জন্য) তোমাদেরকে এমন একটি তরীকা বলে দেব, যা (আমাদের) (এ তরীকা) থেকেও (যাকে তোমরা মন্দ মনে করছ) আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি পাওয়ার দিক দিয়ে অধিক মন্দ ? তা ঐ ব্যক্তিদের তরীকা যাদেরকে (এ তরীকার কারণে) আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রহমত থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন ও যাদেরকে বানর এবং শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের পূজা করেছে। (এখন দেখে নাও এতদুভয়ের মধ্যে কোন্ তরীকা মন্দ। সে তরীকাই মন্দ, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের পূজা হয় এবং যদ্দরুন এসব শাস্তি ভোগ করতে হয়, না ঐ তরীকা মন্দ, যা নির্ভেজাল তওহীদ ও পয়গম্বরদের নবুয়তের স্বীকৃতি ? নিশ্চয়ই এ যাচাইয়ের ফল এই হবে যে,) এমন ব্যক্তিবর্গ (যাদের তরীকা এইমাত্র উল্লেখ করা হল,) আখিরাতে বাসস্থানের দিক দিয়েও (যা শাস্তি হিসাবে তারা প্রাপ্ত হবে) খুবই মন্দ। (কেননা এ বাসস্থান হচ্ছে দোযখ।) এবং (দুনিয়াতে) সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (ইঙ্গিত এই যে, তোমরা আমাদেরকে দেখে উপহাস কর, অথচ তোমাদের তরীকাই উপহাসের যোগ্য। কেননা, এসব কুঅভ্যাস তোমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহুদীরা গো-বৎসের পূজা করেছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা [আ]-কে আল্লাহ্ রূপে গ্রহণ করেছে। অতঃপর তারা নিজেদের আলিম ও মাশায়েখকে আল্লাহ্‌র ক্ষমতা অর্পণ করেছে। এ কারণেই ইহুদীরা যখন শনিবার সম্পর্কিত নির্দেশ অমান্য করে, তখন আল্লাহ্‌র আযাব নেমে আসে এবং তাদেরকে বানর করে দেওয়া হয়। খৃস্টানদের অনুরোধে আসমান থেকে খাঞ্চা অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এরপরও তারা অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করলে তাদেরকে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। এরপর তাদের একটি বিশেষ মুনাফিক দলের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। এরা মুসলমানের সামনে ইসলামী পরিচয় প্রকাশ করত, কিন্তু অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ছিল ইহুদী।) এবং যখন এরা (অর্থাৎ মুনাফিকরা) তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা কুফর নিয়েই (মুসলমানদের মজলিসে) এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থানও করেছে এবং তারা যা (অন্তরে) গোপন করছে আল্লাহ্ তা'আলা তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন (তাই তাদের কপটতা কোন কাজেই আসবে না এবং কুফরের জঘন্যতম শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ——বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে সম্বোধন

করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছু সংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অবতরণের পর তারা তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা ঃ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে, 'তোমরা এরূপ' বললেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ প্রচার কার্যের একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে অর্থাৎ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ لَوْلَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ
وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۭ لَبِئْسَ مَا
كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝

(৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালংঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়! তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর আপনি এদের (ইহুদীদের) মধ্যে অনেককে দেখবেন, তারা দৌড়ে দৌড়ে পাপে, (অর্থাৎ মিথ্যায়) সীমালংঘনে এবং হারাম (মাল) ভক্ষণে পতিত হয়। বাস্তবিকই তাদের এ কাজ মন্দ। (এ ছিল সর্বসাধারণের অবস্থা। এখন বিশিষ্ট লোকদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে যে,) ধর্মীয় নেতা ও আলিমরা কেন তাদেরকে পাপকথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে (বাস্তব অবস্থা ও মাস'আলা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও) নিষেধ করে না? বাস্তবিক পক্ষে তাদের এ অভ্যাস খুবই খারাপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ঃ প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে---যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার জন্য كَثِيرًا (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালংঘন এবং হারাম ভক্ষণ اثم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ---(বাহ্‌রে- মুহীত)

তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায়, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য বলা হয়েছে ঃ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ (তারা দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়)। সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীগণের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কোরআন বলেছে ঃ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্ম-নিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি ঃ সূফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্‌গণ কর্ম সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ঐসব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্য তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজকর্ম আপনা থেকেই সংশোধন হয়ে যায়। উদাহরণত কারও অন্তরে জাগতিক অর্থ লিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি-ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী-বুযুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই

উৎপাটিত হয়ে যায় অর্থাৎ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহংকারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুযুর্গগণ এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থা-পত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোট কথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্ম-ক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা আপনি ধাবিত হয়। পূর্ণ সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

আলিমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজকর্মের দায়িত্ব ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর-মাশায়েখ ও আলিমদেরকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দ কাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি رَبَّانِيُّون এর অর্থ আল্লাহ্‌ভক্ত; অর্থাৎ আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ اَحْبَار ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদীদের আলিমদেরকে 'আহ্‌বার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধে'র মূল দায়িত্ব এ দু' শ্রেণীর কাঁধেই অর্পিত---(এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলিমবর্গ। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ربانيون বলে ঐ সব আলিমকে বোঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে সাধারণ আলিমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককুল ও আলিমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতেও এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আলিম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুঁশিয়ারি ঃ আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ---অর্থাৎ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলিম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তফসীরবিদ আলিমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنعت ও صنع শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসাবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্ব-সাধারণের কু-কর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ---আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলিমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলিমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদ ধারণার ভয়ে মাশায়েখ ও আলিমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলিমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলিমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুঁশিয়ারি আর কোথাও নেই। তফসীরবিদ যাহহাক বলেনঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলিমদের জন্য এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ।--(ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, এ আয়াত দৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ্)। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের তীব্রতা তখনই হবে যখন মাশায়েখ ও আলিমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না ; বরং উল্টা তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় মুজাহিদগণের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোট কথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে আলিম,

মাশায়েখ এবং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করা; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎ কর্ম করা ও অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎ কর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলিমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথা-যথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা ঃ ইসলামের প্রথমে ও পরবর্তী সমগ্র শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতামাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। এ কারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাদীসে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে-মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচরণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। —(বাহ্রে-মুহীত)

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী ঃ মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক জন-পদটি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন ঃ এ জনপদে আপনার অমুক ইবাদত-কারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল ঃ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও ---কারণ, আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা ইবনে নূন (আ)-এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোক-দেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই আছে, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল ঃ এ সৎ লোকগুলোও অসৎ লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি -তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে ওঠেনি। —(বাহ্রে-মুহীত)

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ
بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ
اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا
اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ
وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ
وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ
اَرْجُلِهِمْ ؕ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا
يَعْمَلُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে ঃ আল্লাহ্‌র হাত অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। ওদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্য তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়। আল্লাহ্ অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদেরকে পসন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বন করত তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা ওপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে

ভক্ষণ করত। তাদের কিছু সংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইহুদীদের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও কিছু বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। ঘটনা এই যে, কায়নুকা গোত্রের ইহুদী সর্দার নাব্বাশ ইবনে কায়স এবং কাখখাস আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'কৃপণ' ইত্যাদি ধৃষ্টতামূলক শব্দ ব্যবহার করেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। ---(লুবাব)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ইহুদীরা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলার হাত বন্ধ হয়ে গেছে (অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ্ ---তিনি কৃপণতা করতে শুরু করেছেন ; প্রকৃতপক্ষে) তাদেরই হাত বন্ধ (অর্থাৎ বাস্তবে তারাই কৃপণতাদোষে দোষী অথচ ওরা আল্লাহ্কে দোষারোপ করে।) এবং একথা বলার কারণে তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। (এর ফলে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত, বন্দী, নিহত ইত্যাদি শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরকালে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে এ দোষের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও নেই।) বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। (অর্থাৎ তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। কিন্তু যেহেতু তিনি বিজ্ঞও বটেন, তাই) তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। (সুতরাং ইহুদীরা যে অভাবে পড়েছে, এর কারণ কৃপণতা নয়---বরং এতে তাদেরকে তাদের কুফরীর মজা ভোগ করানোই উদ্দেশ্য।) এবং (ইহুদীদের কুফর ও অবাধ্যতার অবস্থা উদাহরণত এমন যে, তারা নিজেদের উক্তির অসারতা যুক্তি সহকারে শোনার পরও তাদের তা থেকে তওবা করার তওফীক হবে না, বরং) আপনার কাছে আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু প্রেরণ করা হয়, তা তাদের অনেকেই অবাধ্যতা ও কুফরী বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। তা এভাবে যে, তারা তাও অস্বীকার করে। অতএব, আগে যে অবাধ্যতা ও কুফরী ছিল, সেই সাথে এই নতুন অস্বীকৃতি যোগ হওয়ার কারণে তা আরও বেড়ে গেল।) এবং (তাদের কুফরের কারণে যে অভিসম্পাত তথা রহমত থেকে দূর করে দেওয়ার শাস্তি ওদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার জাগতিক লক্ষণাদির মধ্যে একটি এই যে,) আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে (ধর্মের ব্যাপারে) কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। (ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্নমুখী দল-উপদল রয়েছে, যারা একে অপরের শত্রু। সেমতে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে) যখনই ওরা (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে চায় (অর্থাৎ যুদ্ধ করার সংকল্প করে) আল্লাহ্ তা'আলা তা নির্বাপিত করে দেন। (অর্থাৎ তারা ভীত হয়ে যায়---যুদ্ধ করে ভীত হয়, না হয় পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত হতে পারে না।) আর (যখন যুদ্ধ করতে সক্ষম হয় না, তখন অন্যভাবে শত্রুতার ঝাল মিটায়---) দেশে (গোপনে) অশান্তি উৎপাদন করে

বেড়ায়। (যেমন, নও-মুসলিমদেরকে বিপথগামী করা, গোপনে একের কথা অপরের কাছে লাগানো, জনগণকে তওরাতের পরিবর্তিত বিষয়বস্তু শুনিয়ে ইসলাম থেকে বিমুখ করা---) এবং আল্লাহ্ তা'আলা (যেহেতু) অশান্তি উৎপাদনকারীদের ভালবাসেন না (অর্থাৎ ঘৃণার্হ মনে করেন, তাই এসব অশান্তি উৎপাদনকারীদের প্রচণ্ড শাস্তি দেবেন---দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তো অবশ্যই) এবং আহলে-কিতাবরা (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানরা) যদি (যেসব বিষয়ে তারা অবিশ্বাসী, যেমন রিসালতে-মুহাম্মদী, কোরআনের সত্যতা ---এসব বিষয়ের প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে যেসব বিষয় কুফর ও পাপ বলে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকে তাকওয়া (অর্থাৎ সংযম) অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আমি তাদের সব (অতীত) মন্দ বিষয় (.কুফর, শিরক প্রভৃতি গোনাহ্ কথায় হোক কিংবা কাজে হোক---ক্ষমা করে দিতাম এবং ক্ষমা করে) অবশ্যই তাদেরকে (সুখও) শান্তিপূর্ণ উদ্যানে (অর্থাৎ বেহেশতে) প্রবেশ করাতাম (এসব হচ্ছে পারলৌকিক মঙ্গল)। বস্তুত যদি তারা (উল্লিখিত ঈমান ও সংযম অবলম্বন করত, যাকে শব্দান্তরে এরূপ বলা যায় যে) তওরাত ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে [এখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে] প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ কোরআন) পুরোপুরি পালন করত---(রিসালতকে সত্য মনে করাও এর অন্তর্ভুক্ত এবং পরিবর্তিত ও রহিত নির্দেশাবলী এর বাইরে। কেননা, এসব গ্রন্থের সমষ্টি এগুলো পালন করতে বলে না, বরং নিষেধ করে।) তবে তারা (এ কারণে যে) ওপর থেকে (অর্থাৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত) এবং নিচে থেকে (অর্থাৎ মাটি থেকে ফসল উৎপাদিত হত) খুব স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করত (অর্থাৎ ভোগ) করত। এগুলো হচ্ছে ঈমানের পার্থিব কল্যাণ। কিন্তু তারা কুফরীতেই আঁকড়ে রয়েছে---ফলে অভাব-অনটনে গ্রেফতার হয়েছে। যদ্দরুন কেউ কেউ আল্লাহ্ তা'আলার শানে 'কৃপণতা' শব্দ প্রয়োগ করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সব খৃস্টান ও ইহুদী সমান নয়, (সে মতে) তাদের (-ই) একটি সম্প্রদায় সৎপথের অনুগামী (-ও) রয়েছে। (যেমন ইহুদীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সহচরবৃন্দ এবং খৃস্টানদের মধ্যে হযরত নাজ্জাশী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। কিন্তু এঁদের সংখ্যা নেহায়েত নগণ্য।) এবং তাদের (অবশিষ্ট) অধিকাংশই এমন যে, তাদের কাজকর্ম খুবই মন্দ। কেননা, কুফরী ও শত্রুতার চাইতে মন্দ আর কি হবে? হে রসূল (সা)! আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি (লোকের কাছে) তা পৌঁছিয়ে দিন এবং যদি (অসম্ভবকে সম্ভব মনে করে নেওয়া হিসেবে) আপনি এরূপ না করেন, তবে (মনে করা হবে, যেন) আপনি আল্লাহ্ তা'আলার বার্তাও পৌঁছান নি। (কেননা, সমষ্টিগতভাবে এগুলো পৌঁছানো ফরয। সমষ্টিকে গোপন করলে যেমন ফরয পালন ব্যাহত হয়, তেমনি কিছু অংশকে গোপন করলেও ফরয পালন ব্যাহত হয়।) এবং (প্রচার কার্যে কাফিরদেরকে ভয় করবেন না, কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে মানবজাতি থেকে (অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনাকে হত্যা ও খতম করে ফেলবে---এ বিষয় থেকে) রক্ষা করবেন। (আর) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদেরকে (এভাবে হত্যা ও খতম করে দেওয়ার জন্য আপনার দিকে) পথপ্রদর্শন করবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব ঃ وَقَالَتِ الْيَهُودُ—আয়াতে ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মদীনার ইহুদীদের বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে , তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি হিসাবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হতে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্ তা'আলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এ ধরনের ধৃষ্ট উক্তির জবাবেই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো ওদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং চিরকাল থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটেন। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন, যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যাকে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনী নিদর্শনাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফরী এবং অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ওদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা বাক্যে গোপন চক্রান্তের ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ্র নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও আল্লাহ্-ভীতি

অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ্ মাফ করে দেব এবং নিয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

আল্লাহর নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় ঃ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও আল্লাহ্-ভীতির কিছু বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عمل তথা পালন করার পরিবর্তে اقامت তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোন রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকে। যেমন কোন স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোন দিকে ঝুঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে ---ত্রুটিপূর্ণ এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম রূপে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নিয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ফলে উপর নিচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বর্ষিত হবে। উপর-নিচের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে।---(তফসীরে কবীর)

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নিয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার-প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশংকা ছিল যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যে সব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ আশংকা দূর করার জন্য এ ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন ঃ এ বিবরণ থেকে একথাও জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নিয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে তারা এসব নিয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভ করেছে। যেমন আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ।

এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে সেই ইহকালে অবশ্যম্ভাবী রূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসাবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ ধন-দৌলত প্রাপ্ত হন নি, তবে পবিত্র জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ —অর্থাৎ তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছেন। তবে তাদের অধিকাংশই দুষ্কৃতকারী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খৃস্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

প্রচার কার্যের তাকীদ ও রসূল (সা)-এর প্রতি সান্ত্বনা ঃ এ আয়াতদ্বয়ের এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদী ও খৃস্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসাবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সা) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপ হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটাই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফিররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ —বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য, -এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) আজীবন কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা)-র একটি উপদেশ ঃ বিদায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিকে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিকে দয়ার সাগর, পিতামাতার চেয়েও অধিক

স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কিরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন ঃ الا هل بلغت শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দীন পৌঁছিয়ে দিয়েছি? সাহাবীরা স্বীকার করলেন, জী-হ্যাঁ, অবশ্যই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। এরপর বললেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন ঃ فليبلغ الشاهد الغائب অর্থাৎ এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে ঃ (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না। (দুই) যারা তখন পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কিরাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পবিত্র মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন; তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন, যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বুখারীতে হযরত মুয়ায (রা)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اخبر به معاذ عند موته تاثما অর্থাৎ এ আমানত না পৌঁছানোর কারণে গোনাহ্গার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায (রা) হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন। وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসাবে সাধারণভাবে মহানবী (সা)-র সাথে সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রা) বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা) বলেন ঃ প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে দারুণ ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চতুর্দিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। ---(তফসীরে-কবীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এর প্রচারকার্যে কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জিহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِـُٔوْنَ وَالنَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

(৬৮) বলে দিন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধিই পাবে। অতএব, এ কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না। (৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী এবং খৃস্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে আহ্‌লে-কিতাবদের ইসলামের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের বর্তমান তরীকা, যা সত্য বলে তারা দাবী করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তা অসার; মুক্তির জন্য এটা যথেষ্ট নয়, বরং মুক্তি ইসলামের উপরই নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও তাদের কুফরকে আঁকড়ে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ্ (স)-র জন্য সান্ত্বনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। মাঝখানে বিশেষ সম্পর্ক ও প্রয়োজন হেতু প্রচার কার্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে) বলুন ঃ হে আহ্‌লে-কিতাবগণ। তোমরা কোন পথেই নও, (কেননা, অগ্রহণীয় পথে থাকা পথহীন হওয়ারই নামান্তর) যে পর্যন্ত তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ (এখন) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, (অর্থাৎ কোরআন) তারও পুরোপুরি অনুসরণ না করবে। এর অর্থ উৎসাহ প্রদান এবং কল্যাণসমূহ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।) এবং [হে মুহাম্মদ (সা), যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিন্দনীয়, বিদ্বেষ ভাবাপন্ন, তাই এটা] অবশ্যই (যে,) যে বিষয় আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার কাছে প্রেরিত হয় তা তাদের

অনেকেরই ঔদ্ধত্য ও কুফর বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় (এবং এতে আপনার দুঃখিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু যখন জানা গেল যে, তারা বিদ্বেষপরায়ণ) অতএব, আপনি এসব কাফিরের (এ অবস্থার) জন্য দুঃখিত হবেন না। এটা সুনিশ্চিত যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খৃস্টান (তাদের মধ্যে) যে আল্লাহ্‌র প্রতি (অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি) এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং (শরীয়তের আইন অনুযায়ী) সৎকর্ম করে এমন লোকদের (পরকালে) কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আহ্‌লে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ ঃ প্রথম আয়াতে আহ্‌লে-কিতাব, ইহুদী ও খৃস্টানদের শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী প্রতিপালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়ত তওরাত ও ইঞ্জীলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন ; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তর্দৃষ্টি লাভ, ইলহাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্য তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ প্রথম তওরাত, দ্বিতীয় ইঞ্জীল, যা ইহুদী ও খৃস্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ---অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খৃস্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যই রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মর্যাদা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ব্যবহার

করা হয়েছে। এর তাৎপর্য কি? সম্ভবত এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেওয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষা এরূপ ঃ

الا انى اوتيت القران ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وان ما حرم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما حرم الله -

"শোন, আমাকে কোরআন দেওয়া হয়েছে এবং তৎসহ অনুরূপ আরো কিছু। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি আমার কেদারায় বসে বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্য কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল আছে, তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম আছে, তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্র রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহ্র হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।" ---(আবূ-দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী)।

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার ঃ স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যা কিছু বলেন সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতিহাদ ও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার ঃ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লিখিত নেই, বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (তিন) যেসব বিধান তিনি স্বীয় ইজতিহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন, অতঃপর এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

উপরোক্ত তিন প্রকার বিধানই অবশ্য পালনীয় এবং وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত।

সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই আলোচ্য আয়াতে কোরআনের সংক্ষিপ্ত নামের পরিবর্তে وما انزل اليكم من ربكم দীর্ঘ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থাৎ কোরআনে যা স্পষ্টত উল্লিখিত আছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) যা দিয়েছেন, সবই অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় বিধান।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন—এ তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জীল তওরাতের কোন কোন বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিভাবে সম্ভবপর হবে।

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

মহানবী (সা)-র প্রতি একটি সান্ত্বনা ঃ উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ আহ্‌লে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না। বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি ঈমান, সৎকর্মের আহ্‌বান এবং পরকালের মুক্তির ওয়াদা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহ্‌বান জানিয়ে সেজন্য পরকালের মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا অর্থাৎ মুসলমান, দ্বিতীয়ত, اَلَّذِيْنَ هَادُوْا অর্থাৎ ইহুদী, তৃতীয়ত, وَالصَّابِئُوْنَ এবং চতুর্থত, نَصَارٰى এদের মধ্যে তিনটি জাতি—মুসলমান, ইহুদী ও খৃস্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়ূন অথবা সাবেয়া নামে আজকাল পৃথিবীতে কোন প্রসিদ্ধ জাতি নেই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। তফসীরবিদ ইবনে কাসীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়ূন হল তারা যারা ফেরেশতাদের ইবাদত করে, কিবলার উল্টোদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যত এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ কোরআন, ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুর একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহকারে সূরা-বাক্বারার সপ্তম রুকূতে বর্ণিত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ

اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

এতে সহজবোধ্যতার কারণে কিছু শব্দকে আগেপিছে করা হয়েছে। এছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ঃ উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে এবং কোরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও সওয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এ যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ্ ও ভুলত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যত বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ্ এরূপ স্থলে বলে থাকেন ঃ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী, যে-ই আনুগত্য করবে সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছে। যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমার যে কৃপাদৃষ্টি তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার অংশ তিনটি ঃ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎ কর্ম।

রিসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই ঃ এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। এ আয়াত সে ক্ষেত্রও নয় ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে রসূল অথবা রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুষ্ঠুরূপে উল্লিখিত না হওয়ার কোন সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াতে রিসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন-না-কোন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রিসালত উল্লিখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, "প্রত্যেক বিজ্ঞ ইহুদী, খৃস্টান এমন কি মূর্তিপূজারী হিন্দু থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে---পারলৌকিক মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করা কোন জরুরী বিষয় নয়।" (নাউযুবিল্লাহ্)

আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করতে খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন নেই। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি আয়াত উল্লিখিত হলো।

ঈমানে মুফাসসালের বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার শেষভাগে কোরআনের ভাষা এরূপ ঃ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ

সবাই বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি এভাবে যে, তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা কোনরূপ পার্থক্য করি না।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে ঈমানের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে এ কথাও স্পষ্ট-রূপে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন একজন অথবা কয়েকজন পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং সমস্ত পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই শর্ত। যদি একজন রসূলও বিশ্বাস থেকে বাদ পড়েন, তবে এরূপ ঈমান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۝

"যারা আল্লাহ্ এবং রসূলদের অস্বীকার করে, আল্লাহ্ এবং রসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় (অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না) এবং যারা ইসলাম ও কুফরের মধ্যে অন্য কোন রাস্তা করে নিতে চায়, তবে বুঝে নাও যে, তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعى

অর্থাৎ "আজ মূসা (আ) যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।"

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে ---এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি ?

এ ছাড়া যে কোন যুগে যে কোন ধর্ম পালন করাই যদি মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শেষ নবী (সা)-র আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণ এবং এক শরীয়তের পর অন্য শরীয়ত প্রেরণ করা অর্থহীন। প্রথম রসূল যে শরীয়ত ও যে গ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছিলেন, তা-ই যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য রসূল ও গ্রন্থ প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল ? বড়জোর এমন একদল লোক থাকাই যথেষ্ট হত, যারা সেই শরীয়ত ও গ্রন্থের হিফাযত করতেন এবং তা পালন করতে ও করাতে সচেষ্ট হতেন ---সাধারণভাবে যা প্রত্যেক উম্মতের আলিমরা করে থাকেন। এমতাবস্থায় কোরআন পাকের এ উক্তির কি মানে হয় যে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا আমি তোমাদের প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি শরীয়ত ও বিশেষ পথ নির্ধারণ করেছি ?

এরপর এর কি বৈধতা থাকে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ রিসালত ও কোরআনে অবিশ্বাসী ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্য জাতির সাথে শুধু প্রচারযুদ্ধই করেন নি, বরং তরবারির যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন ? ঈমানদার ও আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য যদি শুধু আল্লাহ্র প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট হত, তবে বেচারা ইবলীস কোন্ পাপে বিতাড়িত হল ? আল্লাহ্র প্রতি কি তার বিশ্বাস ছিল না, কিংবা সে কি পরকাল ও

কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিল? সে তো ক্রোধান্বিত অবস্থায় إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত) বলে পরকালে বিশ্বাসী হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছিল।

বাস্তব সত্য এই যে, এ বিভ্রান্তিটি হচ্ছে ঐসব লোকের ভ্রান্ত মতবাদের ফসল, যারা মনে করে যে, দীন বিজাতিকে উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া যায় এবং এর মাধ্যমে বিজাতির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। অথচ কোরআন পাক খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, অমুসলমানদের সাথে উদারতা, সহানুভূতি, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার, মানবতা ইত্যাদি সবকিছুই করা দরকার, কিন্তু ধর্মের চতুঃসীমার পুরোপুরি সংরক্ষণ এবং এর সীমান্তের দেখাশুনার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নয়।

কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, রসূলের প্রতি বিশ্বাস একেবারেই উল্লেখ করা না হত, তবুও অন্য যেসব আয়াতে বিষয়টি জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সে আয়াতগুলোই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, স্বয়ং এ আয়াতেও রসূলের প্রতি বিশ্বাসের দিকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় 'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস' বললে সে বিশ্বাসই ধরতে হবে যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। কোরআনের এ পরিভাষা নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে ঃ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا অর্থাৎ সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাস যেরূপ ছিল, একমাত্র সেরূপ বিশ্বাসই 'আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস' নামে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সাহাবায়ে-কিরামের বিশ্বাসের বড় অন্তই যে 'রসূলের প্রতি বিশ্বাস' ছিল---একথা কারও অজানা নয়। তাই مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ শব্দের মধ্যে 'রসূলের প্রতি বিশ্বাস'ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(৭০) আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং

অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবূল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্ দেখেন, তারা যা কিছু করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে (প্রথমে তওরাতের মাধ্যমে সব পয়গম্বরকে সত্য জানার এবং তাদের আনুগত্যের) অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং (এ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য) তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। (কিন্তু তাদের অবস্থা ছিল এই যে) যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আগমন করতেন, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই (তারা তাদের বিরোধিতা করত) তাদের এক দলের প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং অন্য দলকে (নির্বিবাদে) হত্যাই করে ফেলত। আর (প্রত্যেক বার প্রত্যেক দুষ্কৃতির পর যখন কিছুদিন অবকাশ দেওয়া হয় তখন) তারা এ ধারণাই করে যে, কোন শাস্তিই হবে না। এতে (অর্থাৎ এ ধারণার কারণে) তারা আরও অন্ধ ও বধির (-এর মত) হয়ে গেল (ফলে পয়গম্বরদের সত্যতার প্রমাণাদি দেখল না এবং তাঁদের কথাবার্তাও শুনল না)। অতঃপর (কিছুদিন অতিবাহিত হলে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (অনুকম্পাসহ) মনোনিবেশ করলেন (অর্থাৎ অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন যে, এখনও সৎপথে আসে কি না, কিন্তু) এরপর (সবার না হলেও) তাদের অধিকাংশই (পূর্ববৎ) অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (এসব) কাজকর্ম প্রত্যক্ষকারী। (অর্থাৎ তাদের ধারণা ভ্রান্ত ছিল। সময়ে সময়ে তাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের রীতিনীতি তা-ই ছিল। এখন আপনার সাথেও সেই মিথ্যারোপ ও বিরোধিতার ভূমিকাই পালন করছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمُ

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচি বিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারও প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের কুপরিণাম কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্র নিদর্শন ও তাঁর হুঁশিয়ারি থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত কাজ তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক

পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা বাদশাহ্ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে-নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে ওঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ
الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ
يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا
لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ
ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا
يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اَفَلَا
يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ
وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۭ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ
لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ۭ وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

(৭২) তারা কাফির, যারা বলে ঃ মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্; অথচ মসীহ্ বলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন

সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তিনের এক ; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহ্র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ্ রসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন ; আর তাঁর জননী একজন পরম সত্যবাদিনী। তাঁরা উভয়ই খাদ্য আহার করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টো কোন্ দিকে যাচ্ছে। (৭৬) বলে দিন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্ সব শোনেন, জানেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গেছে, যারা বলে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্ (অর্থাৎ উভয়ে এক ও অভিন্ন) অথচ (হযরত) মসীহ্ স্বয়ং বলেছিলেন ঃ হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর---যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। (এ উক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর প্রতিপালিত ও বান্দা ছিলেন। এতদ-সত্ত্বেও তাকে উপাস্য বলা 'বাদী নীরব, সাক্ষী সরব' এর মত ব্যাপার নয় কি?) নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে (আল্লাহ্তে কিংবা আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যে) অংশীদার স্থির করে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হারাম করে দেন এবং চিরকালের জন্য তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। আর এরূপ অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (যে তাদেরকে দোযখ থেকে উদ্ধার করে জান্নাতে পৌঁছাতে পারে। আল্লাহ্ এবং মসীহ্ উভয়েই এক---এরূপ বিশ্বাস করা যেমন কুফর, তেমনি ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করাও কুফর। সুতরাং) নিশ্চয় তারা কাফির, যারা বলে আল্লাহ্ তা'আলা তিনের (অর্থাৎ তিন উপাস্যের) অন্যতম---অথচ এক (সত্য) উপাস্য ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। (দুইও নেই তিনও নেই। এ বিশ্বাস যখন কুফর ও শিরক, তখন إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ বাক্যে যে শাস্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।) এবং যদি এরা (অর্থাৎ উভয় প্রকার বিশ্বাসী লোকেরা) স্বীয় (কুফরী) বাক্য থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে (বুঝে রাখুক) যারা তাদের মধ্যে কাফির থাকবে, তাদের উপর (পরকালে) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। এরা কি (একত্ববাদের বিষয়বস্তু ও শাস্তিবাণী শুনে) তবুও (স্বীয় বিশ্বাস ও উক্তি থেকে) আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তওবা করে না এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা (যখন কেউ তওবা করে তখন) অত্যন্ত ক্ষমাশীল (এবং) দয়ালু। (হযরত) মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (সাক্ষাৎ আল্লাহ্ কিংবা আংশিক আল্লাহ্) কিছুই নন---শুধু একজন পয়গম্বর, যাঁর পূর্বে আরও (মো'জেযা সমৃদ্ধ) বহু পয়গম্বর বিগত হয়েছেন। [খৃস্টানরা তাঁদেরকে আল্লাহ্ বলে না। সুতরাং যদি পয়গম্বরিত্ব কিংবা অলৌকিকত্ব উপাস্য হওয়ার প্রমাণ হয়, তবে সবাইকেই

উপাস্য আল্লাহ্ হিসাবে মান্য করা উচিত। আর যদি তা উপাস্য হওয়ার প্রমাণ না হয় তবে হযরত মসীহ্কেই উপাস্য বলা হবে কেন ? মোটকথা অন্যান্য পয়গম্বরকে যখন উপাস্য বলছ না, তখন ঈসা (আ)-কেও বলো না]। এবং (এমনিভাবে) তাঁর জননীও (উপাস্য কিংবা আংশিক উপাস্য নয় বরং তিনি) একজন পরম সত্যবাদিনী মহিলা (যেমন অন্যান্য আরও মহিলা পরম সত্যবাদিনী হয়েছেন। তাঁদের উভয়েরই উপাস্য না হওয়ার একটি সহজ যুক্তি এই যে) তাঁরা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন। (বস্তুত যে ব্যক্তি খাদ্য গ্রহণ করে, সে খাদ্যের মুখাপেক্ষী হয়। খাদ্য গ্রহণ জড়ত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং মুখাপেক্ষিতাও জড়ত্ব সৃষ্টির এমন বৈশিষ্ট্য, যা ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ যা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান নয় এবং অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে না, তা উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়)। দেখুন তো আমি কেমন পরিষ্কার যুক্তি-প্রমাণ তাদের জন্য বর্ণনা করছি, আবার দেখুন---তারা উল্টো কোন্দিকে যাচ্ছে। আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন (সৃষ্ট) বস্তুর ইবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না ? (এ অক্ষমতা আল্লাহ্র পরিপন্থী) আল্লাহ্ সব শোনেন ও জানেন (এরপরও তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর না এবং কুফর ও শিরক থেকে বিরত হও না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ—অর্থাৎ হযরত মসীহ্ রূহুল কুদ্স ও আল্লাহ্ কিংবা মসীহ্, মরিয়ম ও আল্লাহ্ সবাই আল্লাহ্। (নাউযুবিল্লাহ্) তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ্। এরপর তাঁরা তিনজনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খৃস্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তি-বিরোধী ধর্ম বিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়। ---(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

মসীহ্ (আ)-র উপাস্যতা খণ্ডন ঃ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ—

অর্থাৎ অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেন নি, যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ্ (আ) যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ---স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেন নি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি, বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীব-জন্তু থেকে সে পরাঙমুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কত কিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে

যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি ঃ মসীহ্ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোক পরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানবমণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ---সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী---যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ্ হয়ে যাবে। (নাউযু-বিল্লাহ্)---(ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী ঃ হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صديقة শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যত বোঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন---নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণত উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نبية বলা হত। অথচ বলা হয়েছে صديقة এটি ওলীত্বের একটি স্তর। (রূহুল-মা'আনী, সংক্ষেপিত)

আলিমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত রয়েছে وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ অর্থাৎ মহানবী (সা)-র পূর্বে পুরুষদের কাছেই ওহী প্রেরিত হয়েছে।---(ইউসুফ, রুকূ ১২, ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ
لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾
كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾
تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ
أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ

كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

(৭৭) বলুন : হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়ম-তনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা এ কারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমালংঘন করত। (৭৯) তারা পরস্পর মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্য মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং রসূল ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব খৃস্টানকে) বলুন : হে আহ্‌লে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে (অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে) অন্যায় বাড়াবাড়ি (ও সীমাতিক্রম) করো না এবং এতে (অর্থাৎ এ বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে) ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ভিত্তিহীন কথাবার্তার) অনুসরণ করো না, যারা (ইতি) পূর্বে নিজেরাও ভ্রান্ত পথে পতিত হয়েছে এবং (নিজেদের সঙ্গে অন্য আরও) অনেককে (নিয়ে ডুবেছে। অর্থাৎ) ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে (এবং তাদের ভ্রান্ত পথে পতিত হওয়া এ কারণে নয় যে, সত্যপথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিংবা তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, বরং) তারা সত্যপথ থাকা সত্ত্বেও (ইচ্ছাকৃতভাবে) তা থেকে বিচ্যুত (ও পৃথক) হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ যুক্তির নিরিখে তাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হওয়ার পরও তারা তা ত্যাগ করে না কেন ?) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কঠোর) অভিসম্পাত (যবুর ও ইঞ্জীলে) করা হয়েছিল, (যা প্রকাশ পেয়েছিল হযরত) দাউদ (আ) ও (হযরত) ঈসা (আ)-র মুখে। (অর্থাৎ যবুর ও ইঞ্জীলে কাফিরদের প্রতি অভিসম্পাত লিখিত ছিল যেমন কোরআন মজীদেও فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ রয়েছে এ গ্রন্থদ্বয় হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা [আ]-র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে এ অভিসম্পাত তাঁদের মুখেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং) এ অভিসম্পাত এ কারণে হয়েছিল. যেহেতু তারা নির্দেশের (বিশ্বাসগত বিরুদ্ধাচরণ করেছিল যা কুফর)। এবং (এ বিরুদ্ধাচরণে) সীমালংঘন করে (অনেক দূরে চলে গিয়ে) ছিল। (অর্থাৎ কুফর ছিল কঠোর ও দীর্ঘায়িত। তারা তা সদাসর্বদাই করত।

সেমতে) তারা যে দুষ্কর্ম (অর্থাৎ কুফর) অবলম্বন করে রেখেছিল তা থেকে (ভবিষ্যতের জন্য) বিরত হত না (বরং তা করেই যেত। সুতরাং তাদের কঠোর ও দীর্ঘায়িত কুফরের কারণে তাদের প্রতি কঠোর অভিসম্পাত হল)। বাস্তবিকই তাদের (এ) কাজ (যা বর্ণিত হল, অর্থাৎ কুফরতাও কঠোর ও দীর্ঘায়িত---) অবশ্যই মন্দ ছিল (যদ্দরুন এ শাস্তি দেওয়া হল)। আপনি (এসব) ইহুদীর মধ্যে অনেককে দেখবেন, (মুশরিক) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, (সেমতে মদীনার ইহুদী ও মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কুফরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কারণে মুসলমানদের সাথে শত্রুতার সূত্রে খুব বন্ধুত্ব বিদ্যমান ছিল)। যে কাজ তারা পরবর্তীর জন্য (অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে ভোগ করার জন্য) করেছে (অর্থাৎ কুফর, যা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতার কারণ ছিল) তা নিঃসন্দেহে মন্দ---(এর কারণে) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি (চিরতরে) অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (এ চিরকালীন অসন্তুষ্টির ফল হবে এই যে) এরা চিরকাল আযাবে থাকবে। আর যদি এরা (ইহুদীরা) আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখত এবং পয়গম্বর [অর্থাৎ (মূসা) আ]-র প্রতি (বিশ্বাস যা তারা দাবী করে) এবং ঐ গ্রন্থের প্রতি (বিশ্বাস রাখত) যা তাদের পয়গম্বরের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল (অর্থাৎ তওরাত) তবে তারা এদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না, কিন্তু এদের অধিকাংশ লোক ফাসিক ও দুরাচার (তাই ঈমানের সীমা থেকে বাইরে চলে যাওয়ার ফলে কাফিরদের সাথে তাদের ঐক্য ও বন্ধুত্ব হয়ে গেছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক ঃ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাঁদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল--যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ অর্থাৎ কোন কোন পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করে ফেলে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্র পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কাউকে কাউকে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্তে

পরিণত করে দিয়েছে ঃ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ---অর্থাৎ যেসব বনী ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ্ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফির হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খৃস্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে قَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ অর্থাৎ ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়ের আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে যে মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।

غلو শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লংঘন করা।

উদাহরণত পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করা হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমালংঘন।

বনী ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি ঃ পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে স্বীকার করা—বনী ইসরাঈলের এ পরস্পরবিরোধী দুটি কাজই হচ্ছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে اَلْجَاهِلُ اِمَّا مُفْرِطٌ اَوْ مُفَرِّطٌ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালংঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন বনী ইসরাঈলের দুটি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দুটি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরের সাথে করেছে অর্থাৎ কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্র সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্লে-কিতাবদের সম্বোধন করে যেসব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেওয়া হয়েছে, তা ধর্ম ও ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হলেই মানুষ পথ-ভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঃ এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু

রয়েছে। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কৃপায় তার জন্য দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশী গ্রন্থ, যা মানুষের জন্য আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ---তা যতই সর্ববিষয় সম্বলিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য যথেষ্ট হয় না বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য দু'টি উপায় রেখেছেন ঃ আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলিম ও মাশায়েখ--এঁরা সবাই এ মানব মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও তাদেরকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حسبنا كتاب الله বাক্যটিকে ভুল অর্থ পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলিমুল গায়ব' এবং আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেওয়া হয়েছে এবং পীরপূজা ও কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্র রসূলকে শুধু একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফির বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্র সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ—আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুর ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় ঃ আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ—বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যামাখশারী প্রমুখ তফসীরবিদ

এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাস'আলায় মুসলিম দার্শনিকরা এবং ফিকহ্ সংক্রান্ত মাস'আলায় ফিকহ্বিদরা এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদদের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদরা বলেন ঃ এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহ্র মাস'আলা যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূলে করীম (সা), সাহাবী এবং তাবেয়ীদের থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ ঃ আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী ইসলাঈলদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا—অর্থাৎ ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ—অর্থাৎ তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে---প্রথমত হযরত দাউদ (আ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র ভাষ্যজনিত এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের ভাষ্যে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আ) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বক্তব্যে। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের উক্তির মাধ্যমে তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফিরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী ইসরাঈলের

সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছিল।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ
وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ
بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

(৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরিক-দেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খৃস্টান বলে। এর কারণ এই যে, খৃস্টানদের মধ্যে আলিম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না। (৮৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের পালনকর্তা আমাদের সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন? (৮৫) অতঃপর তাদের আল্লাহ্ এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দেবেন, যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান (৮৬) যারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযখী।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে মুশরিকদের সাথে ইহুদীদের বন্ধুত্ব বর্ণিত হয়েছিল। এখানে মুসল-মানদের সাথে ইহুদী ও মুশরিকদের শত্রুতা উল্লিখিত হয়েছে। এ শত্রুতাই ছিল তাদের

পারস্পরিক বন্ধুত্বের আসল কারণ। যেহেতু প্রত্যেক ব্যাপারেই কোরআন পাক ন্যায়বিচার ও ইনসাফের পতাকাবাহী, তাই ইহুদী-খৃস্টানদের মধ্যেও সবাইকে এক কাতারে গণ্য করে নি। যার মধ্যে যে গুণ রয়েছে, কোরআন পাক অকুণ্ঠচিত্তে তার স্বীকৃতি দিয়েছে। উদাহরণত কোরআন পাকে বর্ণিত রয়েছে যে, খৃস্টানদের একটি বিশেষ দলের মধ্যে ইহুদীদের তুলনায় মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ কম এবং এ দলের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা যে বিশেষ প্রশংসা ও উত্তম প্রতিদানের যোগ্য, একথাও কোরআন বর্ণনা করেছে। এ বিশেষ দলটি হচ্ছে আবিসিনিয়ার খৃস্টানদের। হিজরতের পূর্বে মুসলমানরা যখন জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়ায় চলে যায়, তখন খৃস্টানদের এ দলটি মুসলমানদের কোনরূপ কষ্ট দেয় নি। অন্য যেসব খৃস্টান এ গুণে গুণান্বিত, ওরাও কার্যত তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এ দলের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন বাদশাহ্ নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গ। তাঁরা আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের মুখে কোরআন শুনে কাঁদতে শুরু করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর ত্রিশ জনের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত হন। তাঁরাও কোরআন শুনে কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং মুসলমান হয়ে যান। এ ঘটনাই হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নযুল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অমুসলিমদের মধ্যে) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের প্রতি অধিকতর শত্রুতা পোষণকারী ইহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন এবং তাদের (অর্থাৎ অমুসলিম লোকদের) মধ্যে মুসলমানদের সাথে (অন্যদের তুলনায়) বন্ধুত্বে অধিকতর নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদের খৃস্টান বলে। (অধিকতর নিকটবর্তী বলার উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু তারাও নয়, কিন্তু উল্লিখিত অন্যান্য কাফিরের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত ভাল)। এটা (অর্থাৎ বন্ধুত্বের অধিক নিকটবর্তী হওয়া এবং শত্রুতায় কম হওয়া) এ কারণে যে, এদের (অর্থাৎ খৃস্টানদের) মধ্যে অনেক বিদ্যোৎসাহী জ্ঞানী ব্যক্তিও রয়েছে এবং অনেক সংসারত্যাগী দরবেশও রয়েছে। (কোন জাতির মধ্যে প্রচুর সংখ্যক এরূপ লোক থাকলে জনগণের মধ্যেও সত্যের প্রতি তেমন বিদ্বেষ থাকে না। যদিও বিশেষ শ্রেণীর লোক ও সর্বসাধারণ সত্যকে গ্রহণও করে না)। এবং এ কারণে যে, এরা (অর্থাৎ খৃস্টানরা) অহংকারী নয়। (এরা জ্ঞানী ও দরবেশদের দ্বারা দ্রুত প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এছাড়া সত্যের সামনে বিনম্র হয়ে যাওয়া বিনয় ও নম্রতার লক্ষণ। এ কারণে তাদের শত্রুতা খুব বেশী নয়। অতএব, জ্ঞানী ও দরবেশ অর্থাৎ আলিম ও মাশায়েখের অস্তিত্ব কর্তাকারণের দিকে এবং নিরহংকার হওয়া কবুল করার যোগ্যতার দিকে ইঙ্গিতবহ। ইহুদী ও মুশরিকদের অবস্থা এর বিপরীত। ওরা সংসারাসক্ত ও অহংকারী। অবশ্য ইহুদীদের মধ্যেও কিছুসংখ্যক সত্যপন্থী আলিম ছিলেন, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, সংখ্যাল্পতার দরুন জনগণের মধ্যে তাদের এমন কোন প্রভাব ছিল না। তাই তাদের মধ্যে এমন প্রতিহিংসা রয়েছে, যা তীব্র শত্রুতার কারণ। ফলে ইহুদীদের মধ্যেও কম সংখ্যক লোকই মুসলমান হয়। মুশরিকদের অন্তর থেকে প্রতিহিংসা দূর হয়ে যাওয়ার পর তারা মুসলমান হতে শুরু করে) এবং (তাদের কিছু সংখ্যক, যারা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল, এমন রয়েছে যে,) যখন তারা রসূল (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালাম (অর্থাৎ কোরআন)

শোনে, তখন আপনি তাদের চক্ষু অশ্রুসজল দেখতে পাবেন এ কারণে যে, তারা সত্য (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে) চিনে নিয়েছে। (অর্থাৎ তারা সত্য শুনে প্রভাবান্বিত হয়ে যায় এবং) তারা বলে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরও তাদের তালিকাভুক্ত করে নিন (অর্থাৎ তাদের মধ্যে গণ্য করুন,) যারা [মুহাম্মদ (সা) ও কোরআনের সত্যতার] সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া আমাদের জন্য এমন কি ওযর থাকতে পারে, যার দরুন আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি এবং যে সত্য (ধর্ম) আমরা (এখন) প্রাপ্ত হয়েছি, তার প্রতি (শরীয়তে মুহাম্মদীর শিক্ষানুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করব না ? এবং (এরপর) এ আশা করব না যে, আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদেরকে সৎ ও (প্রিয়) লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন ? (বরং এরূপ আশা করা ইসলাম গ্রহণের উপরই নির্ভরশীল। তাই মুসলমান হওয়া একান্ত জরুরী)। অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (এ বিশ্বাসপূর্ণ) উক্তির প্রতিদানস্বরূপ (বেহেশতের) এমন উদ্যান দেবেন, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে সর্বদা অবস্থান করবে। বস্তুত সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার। আর (তাদের বিপরীতে) যারা কাফির থেকে যায় এবং আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ নির্দেশাবলীকে) মিথ্যা বলতে থাকে, তারা দোযখের অধিবাসী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতিপয় আহ্লে-কিতাবের সত্যানুরাগ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহ্লে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও আল্লাহ্ভীরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। খৃস্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষত মহানবী (সা)-র আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নব-দীক্ষিত মুসলমানরা কোরায়েশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতেও দেন না। তাই মুসলমানরা কিছু-দিনের জন্য সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রা)-র স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রা)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা তাঁদেরকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তাঁরা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফিরকুলের তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদের সেই দেশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য

অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলা বাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সা)-র আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরায়েশী প্রতিনিধিদলের সব উপঢৌকন ফেরত দিলেন এবং তাদের পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদের কখনও দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবূ তালেবের বক্তৃতার প্রভাব ঃ হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিররা মদীনা যাওয়ার সংকল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খৃস্টান আলিম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সা)-র দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনীয় ও আটজন সিরীয় আলিম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি ঃ প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সা) তাঁদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শোনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে বললেন ঃ এ কালাম হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণ হারাল। মোট কথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণ ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি, বরং পরিশেষে তাঁরা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদদের মতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ —এবং

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদরা এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ সত্যনিষ্ঠ খৃস্টানের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তরকালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন, যাঁরা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য এবং পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ অর্থাৎ মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোট কথা, এ আয়াতে খৃস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয়। নাজ্জাশী এবং তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খৃস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খৃস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন ঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খৃস্টানদের প্রশংসা-কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খৃস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খৃস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খৃস্টানদের মধ্যে আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

অর্থাৎ এসব আয়াতে খৃস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলিম, সংসারত্যাগী ও আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিরা রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহংকার নেই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা আল্লাহ্‌ভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলিমরাও সংসার ত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে জীবিকা উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহাবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করত না।

সত্যানুরাগী আলিম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণস্বরূপ ঃ আলোচ্য আয়াত থেকে একটি

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী আল্লাহ্‌ভীরু আলিম ও মাশায়েখরাই জাতির আসল প্রাণস্বরূপ। তাঁদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলিম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যাঁরা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নন এবং যাঁরা আল্লাহ্‌ভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

(৮৭) হে মু'মিনগণ! তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের দিয়েছেন, তার ভিতর থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।

যোগসূত্র ঃ এ পর্যন্ত আহ্‌লে-কিতাবদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এখন আবার আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান বর্ণিত হচ্ছে, যা সূরার প্রারম্ভে এবং মাঝখানেও কিছু কিছু আলোচিত হয়েছিল। স্থানের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এখানে একটি বিশেষ সম্বন্ধও বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, পূর্বে প্রশংসার স্থলে সংসার ত্যাগ তথা দরবেশীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। তা এর একটি বিশেষ অংশ অর্থাৎ সংসারাসক্তি ত্যাগের দিক দিয়ে হলেও সম্ভাবনা ছিল যে, কেউ সংসার ত্যাগের সমতুল্য বৈশিষ্ট্যকে প্রশংসনীয় মনে করে বসে। তাই এস্থলে হালালকে হারাম করার নিষিদ্ধতা বর্ণনা করা অধিক উপযুক্ত মনে হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন (তা পানাহার ও পোশাক জাতীয় হোক, অথবা বৈবাহিক সম্পর্ক জাতীয় হোক) তন্মধ্যে সুস্বাদু (এবং উপাদেয়) বস্তুসমূহকে (কসম ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে নিজের উপর) হারাম করো না এবং (শরীয়তের) সীমা (যা হালাল-হারামের ব্যাপারে নির্ধারিত হয়েছে) অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা (শরীয়তের) সীমা অতিক্রমকারীদের ভালবাসেন না এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদের দিয়েছেন তার ভিতর থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার কর (ব্যবহার কর) এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী (অর্থাৎ হালালকে হারাম করা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পরিপন্থী। অতএব. ভয় কর এবং এরূপ কাজে বিরত থাক)।